بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ এপ্রিল, ২০২৩ মোতাবেক ০৭ শাহাদাত, ১৪০২ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করে ধর্ম ও শরীয়তকে পূর্ণতা দিয়েছেন আর পবিত্র কুরআনে এই ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا** (সূরা আল্ মায়েদা: ৪)। অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করেছি আর ইসলামকে আমি তোমাদের জন্য ধর্মস্বরূপ মনোনীত করেছি। অতএব এটি মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তাদের জন্য একটি কামিল বা পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত তিনি দান করেছেন। আর এই দাবি কেবল ইসলামেরই রয়েছে, অন্য কোনো ধর্মের (এই দাবি) নেই। অর্থাৎ এখন শেষ ধর্ম হলো ইসলাম যা আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত ধর্ম। যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করতে হয় তাহলে ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া, এর শিক্ষার ওপর আমল করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণা প্রদান করছেন যে, কুরআনী শিক্ষাই এখন মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র মাধ্যম। বরং এই শিক্ষা এতটা পূর্ণাঙ্গ যে, বৈষয়িক উন্নতির বিভিন্ন পথের জন্যও এখন এটিই (একমাত্র) শিক্ষা যা সেদিকে নিয়ে যায়। অতএব যখন আল্লাহ্ তা'লা এই শিক্ষা সম্পর্কে **أَكْمَلْتُ** তথা পরিপূর্ণ হওয়ার ঘোষণা প্রদান করছেন সেখানে এর অর্থ হলো, মানুষের সকল সামর্থ্য-যোগ্যতা, তা নৈতিক হোক বা আধ্যাত্মিক কিংবা দৈহিক, সেগুলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর পরিপূর্ণ শিক্ষা যদি অনুসরণ করতে হয় তাহলে তা কেবল কেবল পবিত্র কুরআনেই পাওয়া সম্ভব। **وَأَتْمَمْتُ** বলে এই ঘোষণা করেছেন এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে করেছেন যে, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন ছিল তা সামগ্রিকভাবে পূর্ণকারী হলো কেবল পবিত্র কুরআন। অর্থাৎ, এমন কোনো (মানবীয়) প্রয়োজন নেই যা পবিত্র কুরআন পরিবেষ্টন করে নি, তা মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজন হোক বা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নত মান অর্জনের প্রয়োজন ও পদ্ধতিই হোক না কেন। একজন মানুষ সুবিচারের দৃষ্টিতে যা-ই দেখতে চায় তা পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় বিদ্যমান রয়েছে। অতএব এই আয়াতের সাথে পবিত্র কুরআন এই ঘোষণা করেছে যে, এখন মানুষের স্থায়িত্ব এই শিক্ষার সাথেই সম্পৃক্ত। আর এই শিক্ষা সকল যুগ ও পুরো বিশ্বের মানুষের জন্য। আর পবিত্র কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সকল শিক্ষা, যা বিভিন্ন নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো সাময়িক এবং সেই যুগের জন্য (নির্ধারিত) ছিল, তা পুরো মানব জাতির জন্য ছিল না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি স্পষ্ট করতে গিয়ে এই ঘোষণাও করেন যে, **এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। আর তিনিই সেই কামিল ও শেষ নবী যাঁর প্রতি এই কামিল শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে।** অতএব এটি হলো আমাদের বিশ্বাস আর এতেই আমরা ঈমান রাখি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আপত্তিকারীরা এই আপত্তি করে যে, এই বিশ্বাসই যদি থাকে আর পবিত্র কুরআনকে যদি

শেষ শরীয়ত ও মহানবী (সা.)-কে শেষ নবী মান্য করেন তাহলে তাঁর দাবির বাস্তবতা বা প্রয়োজন কী? অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি তাহলে কী? আর এই যুগে তাঁর আগমনের প্রয়োজনই বা কী ছিল? এর বিভিন্ন উত্তর রয়েছে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে এর উত্তর দিয়েছেন যে,

যদি তোমরা ইসলামী শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে তাহলে একথা সঠিক যে, আমার আগমনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যুগের সার্বিক অবস্থা আর বিশেষত মুসলমানদের নিজেদের অবস্থা একথা ঘোষণা করছে যে, কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। এরপর এই শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেছিলেন আর এর সংশোধনের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আসার কথা বলেছেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অর্থাৎ মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই শিক্ষাকে ভুলে যাবে। তাদের মাঝে নতুন নতুন বিদআত সৃষ্টি হবে। এ কারণে ধর্মের সংস্কারের জন্য মুজাদ্দিদগণের আগমন হতে থাকবে। আর শেষ যুগে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী আগমন করবেন, যিনি ধর্মকে সুরাইয়্যা (নক্ষত্র) থেকে ধরাপৃষ্ঠে নিয়ে আসবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের সাহিত্যে, রচনাবলীতে, বইপুস্তকে এক কথায় সকল স্থানে এটি বলেছেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে তাঁর শরীয়ত ও ধর্ম এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচারের জন্য এসেছি। আর এখন যেহেতু মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাই এটিকে এবং এর শিক্ষাকেই পৃথিবীর সকল প্রান্তে পৌঁছে দিতে এসেছি। অর্থাৎ, শিক্ষার পূর্ণতা মহানবী (সা.)-এর প্রতি পবিত্র কুরআনের অবতরণের মাধ্যমে হয়েছে। আর সেই যুগে যেহেতু শরীয়ত ও শিক্ষা প্রচারের উপকরণ সহজলভ্য ছিল না তাই এর প্রচারের জন্য বর্তমান যুগে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে প্রেরণ করেছেন। অতএব এটিই সেই কাজ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পাদন করেছেন আর এটিকেই চলমান রাখার জন্য আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এটিই সেই কাজ যা আহমদীয়া জামা'ত তাঁর (আ.) রচিত সাহিত্য এবং তাঁর বর্ণিত কুরআনের তফসীর অনুযায়ী করে যাচ্ছে। আর এই বিষয়ে প্রত্যেক আহমদীর প্রণিধান করা উচিত যে, উক্ত উদ্দেশ্যকে আমরা কতটা বাস্তবায়িত করছি। সামগ্রিকভাবে প্রোগ্রাম হচ্ছে, কার্যক্রম চলছে কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়েও তা হওয়া উচিত। অতএব আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হবে যখন আমরা এই উদ্দেশ্যকে নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখব। এর জন্য আমাদের পবিত্র কুরআন পাঠ এবং তা অনুধাবনের প্রতি সর্বদা মনোযোগী থাকা প্রয়োজন। আর এর জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক এবং নির্দেশাবলী।

পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যাবলী আমি কিছুকাল যাবৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলীর আলোকে বর্ণনা করছি। আজও পবিত্র কুরআনের শিক্ষার পরিপূর্ণ হওয়ার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এটি প্রমাণিত বিষয় যে, পবিত্র কুরআন ধর্মকে পরিপূর্ণ করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। যেমনটি তা নিজেই বলে, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (সূরা আল্ মায়েদা: ৪)। অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছি। আর আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করে সন্তুষ্ট হয়েছি। অতএব পবিত্র কুরআনের পর আর কোনো (ঐশী) গ্রন্থ আসার সুযোগ নেই, কেননা মানুষের যতটা প্রয়োজন ছিল তার সবকিছুই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এখন কেবল খোদার সাথে বাক্যালাপের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের সাথে কথা বলেন, সেই দ্বার উম্মুক্ত আছে। নতুন কোনো শিক্ষা

নেই। আর তা-ও আপনাআপনি উন্মুক্ত হয়নি। বরং সত্য এবং পবিত্র বাক্যালাপ যা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্যভাবে ঐশী সাহায্যের বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে ধারণ করে এবং বহু অদৃশ্যের সংবাদ সংবলিত হয়। তা আত্মশুদ্ধির পর কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের অনুসরণ এবং মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ হয়।

এটি যেহেতু কামিল গ্রন্থ তাই এখন এর অনুসরণ এবং মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের এই পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এছাড়া আর কোনো পথ নেই, কোনো মাধ্যম নেই। আর তিনি (আ.) বলেছেন, আমিও এ কারণেই এই পদমর্যাদা লাভ করেছি। এরপর পবিত্র কুরআন যে কামিল হিদায়াত বা পথনির্দেশনা সে সম্পর্কে তিনি (আ.) অন্যত্র আরো বলেন,

পবিত্র কুরআন শুধু এতটুকুই চায় না যে, মানুষ কেবল পাপ বা অনিষ্ট পরিত্যাগ করেই মনে করবে যে, এখন আমি পুণ্যবান হয়ে গেছি বা কামেল হয়ে গেছি। মন্দকর্ম পরিত্যাগ করলেই পরাকাষ্ঠা অর্জিত হয়ে যায়না বরং এটি তো মানুষকে উন্নতমানের পরাকাষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণে গুণান্বিত করতে চায়। পবিত্র কুরআন শুধুমাত্র পাপমুক্ত করাতেই চায়না বরং (মানুষের মাঝে) সুমহান ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলী এবং উন্নত নৈতিক গুণ সৃষ্টি করতে চায়। অর্থাৎ মন্দকর্মসমূহও পরিত্যাগ করতে হবে এবং তদস্থলে উন্নত নৈতিক চরিত্রও অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ তার হাতে যেন এমন কাজকর্ম সম্পাদিত হয় যা মানবতার কল্যাণ এবং সহানুভূতি নিয়ে হয় আর এর ফলাফল যা দাঁড়াবে তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এই ফলাফল প্রকাশ পাওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

অতএব পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী আমাদের মাঝে এমন চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি হওয়া উচিত। আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমাদের মাঝে এই চিন্তা-চেতনা রয়েছে কী? আমরা কি অন্যদের মতো শুধুমাত্র (কুরআন) পড়ার দাবি করছি না-কি সত্যিকার অর্থেই এসব পরিবর্তনও সৃষ্টি হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। রমযান মাসেও পবিত্র কুরআন পড়া হয়, দরসও শোনা হয়। কাজেই একে (নিজেদের) জীবনে প্রয়োগ করাও আবশ্যক। আর আমরা তো নিজেদের বয়আতের শর্তেও এই অঙ্গীকার করেছি অর্থাৎ বয়আতের দশটি শর্তে একথা লিখা আছে যে, পবিত্র কুরআনের অনুশাসন ষোলোআনা শিরোধার্য করবো। অতএব যদি আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে এই রমযানে এর প্রতি আমল করার অঙ্গীকার করে এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার এক দৃঢ় সংকল্প করে নেয় তাহলে যেখানে আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করবো সেখানে আমাদের সমাজও জান্নাতপ্রতীম সমাজে পরিণত হবে। পারিবারিক ও বংশগত ঝগড়া-বিবাদ যা বিভিন্ন সময়ে দেখা দেয় তা ভালোবাসা ও প্রীতিতে রূপ নিতে পারে।

ঐশী শরীয়তের বীজ পবিত্র কুরআনের যুগে স্বীয় উৎকর্ষতায় পৌঁছে গিয়েছিল, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে {তিনি (আ.)} বলেন,

"যেহেতু পবিত্র কুরআন সৎকর্মের আদেশ এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গীন গ্রন্থ। করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদানে এবং বারণকৃত কাজ সম্পর্কে বর্ণনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ। ষোলোআনা বাতলে দিয়েছে যে, কি করতে হবে আর কি করা যাবে না। আর এক্ষেত্রে খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো, মানবীয় প্রকৃতিতে যেসব চরম বিকৃতি দেখা দিতে পারে আর ভ্রষ্টতা ও অপকর্মের ক্ষেত্রে সে যতটা অগ্রসর হতে পারে; পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সেসব অপকর্মের সংশোধন; তাই এমন সময়ে তিনি পবিত্র কুরআন

অবতীর্ণ করেছেন যখন মানবজাতির মাঝে এসব মন্দকর্ম বা বিকার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আর ধীরে ধীরে মানবপ্রকৃতি সকল প্রকার মন্দ বিশ্বাস ও অপকর্মে কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। আর এটিই ঐশী প্রজ্ঞার দাবি ছিল অর্থাৎ এমন সময়েই যেন তাঁর পূর্ণ শিক্ষা বা কামেল কিতাব অবতীর্ণ হয়। কেননা পাপ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সেসব মানুষকে সেসব অপরাধ ও মন্দবিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করা যেগুলো সম্পর্কে তারা একেবারেই অনবহিত, তা যেন তাদেরকে পাপের দিকে আকৃষ্ট করারই নামান্তর। আগেই বলে দেয়া যে, এই এই পাপ রয়েছে, যা (তারা) জানেই না, যেগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণাই নাই; এগুলোর মাধ্যমে তো পাপ বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে আমরা এটিই দেখছি যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদেরকে এমন যৌন সম্পর্কের কথা অবহিত করা হয়, যে বিষয়ে শিশুদের কোনো ধারণাই নেই। এতে তারা উৎকণ্ঠিত ও হতভম্ব হয়। এখন তো পিতামাতারাও বলতে আরম্ভ করেছে যে, এগুলো কি পড়ানো হচ্ছে! বরং শিক্ষাবিভাগও এ বিষয়টিকে খতিয়ে দেখছে। কোনো কোনো শিক্ষক (এক্ষেত্রে) সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ এমনসব বিষয় যেগুলো সম্পর্কে (শিশুরা) জানেই না, তারা (অথাৎ শিক্ষকরা) স্বয়ং তাদের মধ্যে (তা) সৃষ্টি করছে যা মূলত সাবালক বা প্রাপ্তবয়সে বয়সে উপনীত হওয়ার পর তাদের জানার কথা। আর এটিই মানব রচিত বিধান এবং শরীয়তের বিধানের মাঝে (মূল) পার্থক্য। এটিই (মানব রচিত) আইন ও পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন নির্দেশনা প্রদান করে এবং স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, এই বয়সের (শিশুর) জন্য এই হলো নির্দেশনা এবং এই বয়সের (মানুষের) জন্য এই আদেশ। এমন নয় যে, সবকিছু একেবারেই প্রকাশ করে দিয়েছে। এরপর সেসব বাক্যাবলী থেকেই ধীরে ধীরে প্রত্যেকের বিবেক ও বুদ্ধি অনুযায়ী তফসীর বা ব্যাখ্যা সামনে আসতে থাকে। তিনি (আ.) বলেছেন, অতএব হযরত আদমের মাধ্যমে খোদার ওহীর বীজ বোপিত হওয়া আরম্ভ হয় এবং খোদা তা'লার শরীয়ত (অর্থাৎ) পবিত্র কুরআনের যুগে সেই বীজ পূর্ণতা লাভ করে এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। যেভাবে পাপ বিস্তার লাভ করতে থাকে, এর চিকিৎসাও যুগের নিরিখে প্রকাশিত হতে বা অবতীর্ণ হতে থেকেছে। আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষার মাঝে প্রত্যেক যুগে উদ্ভূত পাপের চিকিৎসা করার বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান রয়েছে। যা আল্লাহ্ তা'লার পুণ্যবান বান্দা ও তফসীরকারকদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

পুনরায় {তিনি (আ.)} বলেন, যেহেতু কামেল বা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এসে সংশোধন করার কথা তাই এই কিতাবের অবতীর্ণ হওয়ার সময় তার অবতরণ স্থলে (আধ্যাত্মিক) ব্যাধিও চরমরূপে বিরাজমান থাকা আবশ্যক ছিল, যাতে প্রত্যেক রোগের পরিপূর্ণ চিকিৎসা প্রদান করা যায়। অতএব সেই (আরব) উপদ্বীপ চরম (আধ্যাত্মিক) ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। যাদের মধ্যে সেসব আধ্যাত্মিক রোগ বিরাজ করছিল, অর্থাৎ আরবে। যাতে তৎকালীন কিংবা পরবর্তী প্রজন্ম আক্রান্ত হওয়ার ছিল। এখানে আরো স্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ যা তখন বিদ্যমান ছিল অথবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবি ছিল, সেই শিক্ষা দিয়ে দেন। কেননা যুগ (বেশি) দূরে যাওয়ার ছিল না, শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করছিল তাই ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটতে পারতো তাও স্পষ্ট করে দেয় আর বলে দেয় যে, কতটা প্রকাশ করবে এবং কতদূর প্রকাশ করবে। এ কারণেই তফসীরকারকগণ যুগের নিরিখে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। {তিনি (আ.)}বলেন, এ কারণেই পবিত্র কুরআন সকল শরীয়তকে সম্পূর্ণ করেছে। অন্যান্য গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার সময় এই প্রয়োজনীয়তা ছিল না আর সেগুলোতে এমন পরিপূর্ণ শিক্ষাও

ছিল না। তিনি (আ.) এখানে এটি প্রমাণ করেন যে, স্বয়ং খ্রিষ্টান ও ইহুদীরাও এ বিষয়টি স্বীকার করে যে, যুগ সকল অর্থে চরমভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল আর তখন একটি শরীয়তের প্রয়োজন ছিল।

পবিত্র কুরআন কখনোই কোনো মানবীয় বাণীর সদৃশ হতে পারে না, এই বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে উদাহরণস্বরূপ তিনি (আ.) বলেন, যখন কতেক বক্তা ও সুলেখক নিজেদের জ্ঞানের বলে একটি প্রবন্ধ লিখতে চায়। (অর্থাৎ বাকপটু কিংবা সুলেখক যদি নিজেদের জ্ঞানের শক্তিতে এমন কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চায়) যা অত্যুক্তি, মিথ্যা, অতিশয় সংযোজন, অনর্থক, অপলাপ এবং সকল নিরর্থক বক্তব্য, অগোছালো ভাষা এবং প্রাঞ্জলতা বহির্ভূত এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্পূর্ণতা পরিপন্থী ব্যাধি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। (অর্থাৎ একজন সুলেখক সকল প্রকার মিথ্যা মনগড়া বক্তব্য, অযথা কথাবার্তা, অপলাপ, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি এবং সকল প্রকার অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা এবং বিভ্রান্তিকর জটিল কথাবার্তা যা মানুষের বোধগম্যই হয় না, এবং এমনসব প্রজ্ঞাশূন্য এবং প্রাঞ্জলতা বহির্ভূত কথাবার্তা থেকে মুক্ত বিষয় লিখতে চেষ্টা করে।) এগুলোই একজন সুলেখকের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সকল প্রকার বাজে বিষয় থেকে তার রচনা মুক্ত ও পবিত্র হবে। আর ষোলোআনা সত্য, প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, সুস্পষ্টতা, সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে। কাজেই, এমন প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিই সর্বাগ্রে থাকবে যে জ্ঞানশক্তি, জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং সবকিছুর ওপর যার সার্বিক দৃষ্টি রয়েছে এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে নৈপুণ্যে সবার চেয়ে উন্নত এবং বক্তৃতা ও লেখনীর ক্ষেত্রে যুগে সর্বাধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ। (অর্থাৎ যে খুব ভালো লেখাপড়া জানা শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ হবে সে ব্যক্তিই এমন প্রবন্ধ লিখতে পারে।) অর্থাৎ যে এসব দুর্বলতা থেকে পবিত্র বা মুক্ত হবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতায়, জ্ঞানে, গুণে, দক্ষতায় মেধায় ও বুদ্ধিতে তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের, আর অধঃপতিত সে রচনার শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে তার সমপর্যায়ের হতে পারে না। (অর্থাৎ যার মধ্যে এসব যোগ্যতা নেই সে কোনোভাবেই তার সমপর্যায়ের হতে পারে না।) তিনি (আ.) বলেন, যেমন একজন দক্ষ ডাক্তার যে চিকিৎসাশাস্ত্রে পূর্ণ দক্ষতা রাখে। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার যে দক্ষতা রাখে যার দীর্ঘকালের পেশাদারিত্বের কল্যাণে রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরূপনের পূর্ণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা রয়েছে অর্থাৎ সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে নেয়। রোগ সম্পর্কেও তার পূর্ণাঙ্গীণ জ্ঞান রয়েছে। তাছাড়া কথায় ও বক্তৃতায় সে অনন্য– বাড়তি একটি বৈশিষ্ট্য তার মাঝে রয়েছে বা বাকপটুতা রাখে এছাড়া পদ্য ও গদ্যে যুগে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ খুবই ভালো। যেভাবে সে একটি রোগের সূত্রপাতের অবস্থা এবং তার লক্ষণ এবং উপসর্গ খুবই উন্নত ভাষায়, অত্যন্ত সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ভাষায়, যথাযথরূপে ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করতে পারে। তার তুলনায় অন্য কেউ যার চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্কও নেই এবং কথা বলার স্পর্শকাতর দিকগুলো সম্পর্কেও যে অজ্ঞ সে তার মতো বর্ণনা করবে– তা কখনোই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তির মাঝে এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না সে এসব বিষয় কোনোভাবেই বর্ণনা করতে পারে না। অর্থাৎ একজন জ্ঞানী মানুষ যার নিজের পেশায়ও দক্ষতা রয়েছে তাছাড়া কথাও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং গবেষণাও ভালো করে, সে যেভাবে বর্ণনা করতে পারবে তার বিপরীতে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি তেমনটি করতে পারে না। তার মর্যাদা তার চেয়ে অবশ্যই উন্নত পর্যায়ের। তিনি (আ.) বলেন, এ বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট ও সর্বজন বিদিত যে, অজ্ঞ ও জ্ঞানীর বক্তৃতায় অবশ্যই কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে এবং মানুষ যতটুকু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, স্বভাবতই তার জ্ঞানের গভীরতা তার

জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় সেভাবে ফুটে উঠে যেভাবে কোনো স্বচ্ছ আয়নায় চেহারা দেখা যায়। আর সত্য ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করার সময় তার মুখ থেকে যে শব্দাবলী নিঃসৃত হয় তা তার জ্ঞানগত যোগ্যতা অনুমান করার জন্য একটি মাপকাঠি হয়ে থাকে। আর যে কথা জ্ঞানের ব্যাপকতা ও বুদ্ধির উৎকর্ষতা থেকে উৎসারিত হয় আর যে কথা সংকীর্ণ ও অসার এবং অন্ধকার ও সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত হয়– এ উভয় প্রকার কথার মাঝে কতই না পার্থক্য রয়েছে। একটি হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝরনা আর একটি হলো নিতান্তই ভাসাভাসা (বা সারশূন্য) কথা, এ উভয়ের মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থক্য সহজেই বুঝা যায়। তিনি (আ.) বলেন, পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়, যেমন ঘ্রাণশক্তির সামনে কোনো প্রকৃতিগত বা সাময়িক বিপত্তি যদি না থাকে তাহলে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের মাঝে পার্থক্য একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। তুমি যতটা পারো চিন্তা করে দেখো এবং যত পারো ভাবো, এই সত্যের কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না। এটি নিটোল সত্য কথা এবং কোনো দিক থেকে এতে কোনো বিপত্তি দেখতে পাবে না। অতএব যেখানে সর্বদিক থেকে এটি প্রমাণিত যে, জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তির মাঝে যে পার্থক্য সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন থাকে তা কথার মাঝে অবশ্যই প্রকাশ পায়, এটি কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে, জ্ঞান ও বুদ্ধির বিবেচনায় যারা উন্নত ও উচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকে তারা বাগ্মিতা ও রূপকের ব্যবহারে অন্যদের সমান হয়ে যাবে। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানরা অবশ্যই উন্নত পর্যায়ে থাকবে, তারা একজন সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ের হবে না। আর উভয়ের মাঝে কোনো স্বাতন্ত্র্য থাকবে না তা হতে পারে না। এই সত্যতা প্রমাণিত হওয়া দ্বিতীয় অপর এক সত্যতার প্রমাণ বহন করে অর্থাৎ ঐশী বাণী সর্বদা মানুষের বাণীর তুলনায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণ-বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত এবং অতুলনীয় হওয়া আবশ্যক। অতএব এই উদাহরণ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার বাণী অন্য সব কিছুর চেয়ে উন্নত। আল্লাহ্ তা'লাই সকল জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তার মতো জ্ঞান তো কারো নেই। কেননা কারো জ্ঞান খোদার পরিপূর্ণ জ্ঞানের সমপর্যায়ের হতে পারে না আর এদিকেই ইঙ্গিত করে খোদা বলেছেন, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ (সূরা হূদ: ১৫)। অর্থাৎ, যদি কাফিররা এই কুরআনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করতে পারে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তোমরা জেনে রাখো এই কালাম খোদার জ্ঞানে নাযিল হয়েছে, মানুষের জ্ঞানে নয়।" যদি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে না পারে তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এটি মানুষের নয় বরং খোদার বাণী।

"যার ব্যাপক ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের বিপরীতে মানবীয় জ্ঞান অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন। এই আয়াতে অবরোহ যুক্তির আদলে প্রভাবকে প্রভাব বিস্তারীর অস্তিত্বের প্রমাণ আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, "ভিন্নভাবে বললে সার কথা এটি দাঁড়াবে যে, ঐশী জ্ঞান স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতায় মানুষের ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে কখনো সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে না। বরং যে বাণী এই পরিপূর্ণ ও অতুলনীয় জ্ঞান থেকে নিঃসৃত হয়েছে সেটাও পুর্ণাঙ্গীন ও অনন্য হওয়া এবং মানুষের বাণী থেকে পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব পবিত্র কুরআনে এই শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত।

কাজেই প্রত্যেক দিক থেকে কুরআনের কামিল হবার দাবি রয়েছে, আর কেউ এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না, আর আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারে নি আর ভবিষ্যতেও করতে পারবে না।

তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআন যেভাবে একজনকে জ্ঞানগত সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত করে তেমনিভাবে কর্মগত পরম মার্গও এরই মাধ্যমে লাভ হয়। আর এক আল্লাহ্‌র

সন্নিধানে গ্রহণীয় হওয়ার চিহ্ন ও জ্যোতি তাদের মাঝেই প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং এখনও প্রকাশিত হয়, যারা এই পবিত্র বাণীর অনুসরণ করেছে। এছাড়া অন্যদের মাঝে কখনোই প্রকাশিত হয় না। অতএব সত্যান্বেষীদের জন্য এই প্রমাণই যথেষ্ট যা সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে, আর তা হলো; ঐশী কল্যাণরাজি ও খোদার নিদর্শন শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের কামিল অনুসারীদের মাঝেই দৃষ্টিগোচর হয়। পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণ করলেই নিদর্শনাবলীও দেখতে পাবে। লোকেরা প্রশ্ন করে, আমরা তো নিদর্শন দেখলাম না বা এত দিন দোয়া করেছি কিন্তু দোয়া গৃহীত হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এজন্য প্রথমে আমার কথা শোনো, আমার প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখো, আমার আদেশ পালন করো। যখন এমনটি করবে তখন আল্লাহ্ তা'লা দোয়াও শোনেন। অথএব কুরআনের শিক্ষার প্রতি ষোলোআনা আমলকারীগণই অসাধারণ কল্যাণরাজি অর্জন করে– এটিও পবিত্র কুরআনের শিক্ষারই বৈশিষ্ট্য।

তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন পরম সংক্ষিপ্ত পরিসরে সকল ধর্মীয় সত্যকে পরিবেষ্টন করেছে।

মু'জিযা নয় বরং আলিফ-ইয়ে-জিম দিয়ে এজায, যার অর্থ সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থবহ বিষয়বস্তু।

এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন স্বীয় বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতাকে– সত্য, প্রজ্ঞা ও প্রকৃত প্রয়োজনের দৃষ্টিকোন থেকে বর্ণনা করেছে। পরম সংক্ষেপণের নৈপুণ্যে ধর্মীয় সকল সত্যকে পরিবেষ্টন করে দেখিয়েছে। এতে সকল বিরোধী ও অস্বীকারকারীকে নির্বাক করার জন্য অজস্র সমুজ্জ্বল যুক্তি প্রমাণ বিদ্যমান। আর মু'মিনদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য হাজার হাজার গুঢ়তত্ত্বের ও সত্যের একটি গভীর ও স্বচ্ছ সমুদ্র এতে প্রবহমান দেখা যায়। যেসব বিষয়ে বিশৃঙ্খলা দেখেছে সেগুলোর সংশোধনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। যে তীব্রতার সাথে কোনো বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রাধান্য বিস্তার করেছে অনুরূপ তীব্রতার সাথে সেটিকে প্রতিহতও করেছে। যত প্রকার ব্যাধি বিস্তৃত দেখেছে সেগুলোর চিকিৎসাপত্র প্রস্তাব করেছে। মিথ্যা ধর্মগুলোর প্রত্যেক সন্দেহের নিরসন করেছে। মিথ্যা ধর্মগুলো যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাদের যে সন্দেহ রয়েছে সেগুলোকে দূরীভূত করেছে। প্রত্যেক আপত্তির উত্তর দিয়েছে। এমন কোনো সত্য নেই যা বর্ণনা করে নি। প্রত্যেক ভ্রষ্ট ফিরকার অপনোদন লিপিবদ্ধ করেছে।" পথভ্রষ্ট লোকদের খণ্ডনে কথা বলেছে। প্রত্যেক বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। "আর পরাকাষ্ঠা হলো এমন কোনো কথা নেই যা অপ্রয়োজনে লিখেছে। কোনো কথা অযথা বর্ণনা করে নি। আর কোনো অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নি। আর কোনো কথা বৃথা বলা হয়নি এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি বাগ্মিতার ক্ষেত্রে নিজের সেই মর্যাদা প্রতিভাত করেছে যার চেয়ে বেশি কল্পনাও করা যায় না। সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে সন্নিবেশন করেছে। কিন্ত প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মিতা এমন যে, এর চেয়ে উন্নত ভাবাই যায় না এবং প্রাঞ্জলতাকে এমন উৎকর্ষতায় পৌঁছিয়েছে যে, পরম আকর্ষণীয় বিন্যাস, সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য বর্ণনার মাধ্যমে পূর্বাপরের (সমস্ত) জ্ঞানকে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছে। পূর্ববর্তী লোকদের জন্যও এটি জ্ঞানভাণ্ডার ছিল, পূর্বেই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি; হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আরবের যারা মরুবাসী, গ্রাম্য ছিল তারাও কুরআন বুঝেছে এবং তারা খোদাপ্রেমিক মানুষে পরিণত হয়েছে, শিক্ষিত মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে আর যারা জ্ঞানী ছিল তারাও নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী অনুধাবন করেছে আর এরপর

শুধু তাদেরকেই নয় বরং আদ্যান্তের সকলকেই। শেষ যুগ অর্থাৎ শেষ যুগের লোকদের কাছেও পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এমনই যে, প্রত্যেক যুগে যার তফসীর হচ্ছে; এর প্রতিটি শব্দের নতুন নতুন অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে যা যুগের নিরিখে আমাদের কাছে বোধগম্য হয়। তিনি (আ.) বলেন, একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তকে এসবকিছু সন্নিবেশিত করেছেন যেন মানুষ যার জীবন স্বল্প এবং কাজ অনেক, সে অসংখ্য সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পায় এবং এ বাগ্মিতার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় প্রচার-প্রসারে যেন ইসলাম উপকৃত হয় এবং মুখস্থ করা বা স্মরণ রাখাও সহজ হয়। মানুষ পবিত্র কুরআন মুখস্ত করে, শিশুরাও স্বল্প বয়সে মুখস্ত করে ফেলে। তিনি (আ.) তাঁর পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়াতে এটি প্রমাণ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনই সেই কিতাব যা স্বীয় বাক্যাবলী এবং ভাষার নিরিখে এমন সত্যতা বর্ণনা করে যা অন্য কোথায় পাওয়া যায় না আর ইঞ্জিল প্রভৃতি কিতাবসমূহ তো মানবীয় হস্তক্ষেপের কারণে এখন আর ঐশী গ্রন্থ হিসেবেই গণ্য হয় না।

পুনরায় তিনি (আ.) পবিত্র কুরআনের ভাষাগত সংক্ষিপ্ততার শ্রেষ্ঠত্বের কথা আরেক স্থানে এভাবে বর্ণনা করেন যে, যখন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ করবে, তাৎক্ষণিকভাবে সে অনুধাবন করবে যে, পবিত্র কুরআন ভাষাগত সংক্ষিপ্ততায় বাগ্মিতার অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় উপকরণ তথা অতি সংক্ষিপ্ত শব্দে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সেই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে যে, ধর্মের প্রয়োজনীয় সব দিক তুলে ধরা এবং সমস্ত দলিলপ্রমাণে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আকৃতির দিক থেকে এমন ক্ষুদ্রাকৃতির যে, মানুষ কেবল তিন চার প্রহরে প্রাণভরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলতে পারে। এত সংক্ষিপ্ত যে, মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে তা পড়ে ফেলতে পারে। এখন ভেবে দেখা উচিত যে, কুরআনের প্রাঞ্জলতা কত চমৎকার মু'জিযা যে, জ্ঞানের এক তরঙ্গায়িত সমুদ্রকে তিন চার খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করে ফেলেছে এবং প্রজ্ঞার এক বিশাল জগতকে কেবল কয়েক পৃষ্ঠার মাঝে আবদ্ধ করেছে। কেউ কি কখনো দেখেছে বা শুনেছে যে, এমন ক্ষুদ্রাকৃতির একটি কিতাব সকল যুগের সত্য নিজের মাঝে ধারণ করে থাকবে? বিবেক কোন্ মহান ব্যক্তির জন্য এই উচ্চ মর্যাদা প্রস্তাব করতে পারে যে, সে সামান্য কিছু শব্দ দ্বারা প্রজ্ঞার এক সমুদ্র ভরে দেবে যা হতে ধর্মীয় জ্ঞানের কোনো সত্য বাইরে থাকবে না। তিনি এখানে হিন্দুদের গ্রন্থ বেদ এর তুলনা করছিলেন এবং প্রমাণ করেন যে, বেদে তো এমন কিছু বর্ণিতই হয় নি যা কুরআন বর্ণনা করেছে আর বেদের বাদ্যগুলো অতি দীর্ঘ যা পাঠ করাই কষ্টকর। তিনি সকল ধর্মকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, আসো! আমি তোমাদেরকে পবিত্র কুরআনের এসব সৌন্দর্য দেখাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছাড়া এ যুগে এমন কেউ নেই যে এভাবে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকবে। এরপরও আমাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আমরা নাকি নাউযুবিল্লাহ কুরআন অবমাননাকারী।

পবিত্র কুরআনের যুগ পরিপূর্ণ শিক্ষার দাবিদার ছিল- এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনই কেবল পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে এবং একমাত্র পবিত্র কুরআনই এমন যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল যাতে পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক ছিল। এর কিছুটা উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে। অতএব পবিত্র কুরআ যে কামিল শিক্ষা হওয়ার দাবি করেছে এই দাবি করার অধিকার কেবলমাত্র এরই ছিল; এ ছাড়া অন্য কোনো ঐশী গ্রন্থ এমন দাবি করে নি।

তিনি (আ.) বলেন, আমাদের মতে মু'মিন সে যে প্রকৃতঅর্থে পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করে এবং পবিত্র কুরআনকে খাতামুল কুতুব বলে বিশ্বাস করে– মু'মিনের চিহ্ন

এটি। আর মহানবী (সা.)-এর আনীত শরীয়তকে চিরস্থায়ী মান্য করে এবং এতে এক অণু পরিমাণ কিংবা বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করে না এবং এর অনুসরণে বিলীন হয়ে নিজেকে নিঃশ্বেষ করে ফেলে এবং নিজ সত্তার প্রতিটি বিন্দু এ পথে উৎসর্গ করে এবং ব্যবহারিক ও জ্ঞানগতভাবে এই শরীয়তের বিরোধিতা করে না, কেবল তখনই সে প্রকৃত মুসলমান হবে।

এখন আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পবিত্র কুরআন সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ, এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন এমন এক যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল যে যুগে সবধরনের প্রয়োজন বা চাহিদা যা সম্মুখে আসা সম্ভব ছিল সেগুলো সম্মুখে এসে গিয়েছিল অর্থাৎ সমস্ত চারিত্রিক, বিশ্বাসগত আর কথা ও কর্মসংশ্লিষ্ট বিষয় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল আর বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য এবং সকল প্রকার নৈরাজ্য চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। তাই পবিত্র কুরআনের শিক্ষাও অবতীর্ণ হয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ের। অতএব এই অর্থে কুরআনী শরীয়ত খতমকারী ও পরিপূর্ণ আখ্যা পেলো। আর পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহ অপরিপূর্ণ ছিল কেননা পূর্ববর্তী যুগে ঐসব নৈরাজ্য যেগুলোর সংশোধনের জন্য ঐশী কিতাবসমূহ এসেছিল সেগুলোও চরম সীমায় উপনীত হয় নি কিন্তু পবিত্র কুরআনের যুগে ঐসব বিষয় চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। অল্প বয়স্ক অথবা যৌবনে পদার্পণকারী অনেকে যারা প্রশ্ন করে থাকেন তাদের জন্য এই উত্তর। প্রথমে ঐসব বিষয় চরম সীমায় ছিল না। এখানে (বিকৃতি) চরম সীমায় উপনীত হয়েছে বিধায় শিক্ষাও চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে আর তাই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এজন্য মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তি রচিত হয়েছে। অতএব এখন পবিত্র কুরআন এবং অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের মাঝে পার্থক্য হলো, পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী সব ধরনের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত থাকলেও তা শিক্ষার ত্রুটির কারণে কোনো এক সময়ে পরিপূর্ণ শিক্ষা অর্থাৎ পবিত্র কুরআন প্রকাশিত বা নাযিল হওয়া আবশ্যক ছিল। তাদের সম্মুখে কতিপয় বিষয় আসেই নি তাহলে তারা সেগুলো কীভাবে বর্ণনা করতো? সেগুলোর শিক্ষার ঘাটতি ছিল তাই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। তিনি (আ.) আরো বলেন, পবিত্র কুরআনের পর আর কোনো ঐশী গ্রন্থ আসা আবশ্যক নয় কেননা, চূড়ান্তের পর আর কোনো স্তর বাকি থাকে না। তবে হ্যাঁ, যদি ধরে নেয়া হয় যে, পরবর্তীতে কোনো এক যুগে পবিত্র কুরআনের নীতিগত বিষয়গুলো বেদ এবং ইঞ্জিলের শিরকীয় নীতিতে বদলে দেয়া হবে এবং তৌহীদের শিক্ষার মাঝে পরিবর্তন করা হবে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে বা যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোনো যুগে কোটি কোটি মুসলমান যারা তৌহীদ আ একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তারাও শিরকের পথ এবং সৃষ্টিপূজা করতে আরম্ভ করবে তখন নিঃসন্দেহে এমতাবস্থায় ভিন্ন শরীয়ত এবং ভিন্ন রসূল আগমন করা আবশ্যক হবে। {এমন পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় তাহলে হতে পারে হবে কিন্তু এমনটি হওয়া অসম্ভব, এমনটি হতেই পারে না কেননা আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমি এই শরীয়তকে সুরক্ষিত রাখব এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন, আর এটিই আমাদের দায়িত্ব।}

এরপর তিনি (আ.) বলেন, পরিত্রাণের জন্য যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বার বার বলেছেন- সেটিই আবশ্যক আর তা হলো, প্রথমত স্বচ্ছ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় মান্য করা এবং মহানবী (সা.)- কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করা আর পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্‌র কিতাব মান্য করা অর্থাৎ এই বিশ্বাস রাখা যে, কিয়ামত পর্যন্ত আর

কোনো ঐশী কিতাব বা শরীয়ত আসবে না অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের পর এখন আর কোনো ঐশী গ্রন্থ বা শরীয়তের প্রয়োজন নেই।

কুরআনী ওহীর মহিমা- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, তাদের ওপর খোদা তা'লার অভিসম্পাত যারা দাবি করে যে, তারা কুরআনের অনুরূপ কোনো কিতাব আনতে পারে। পবিত্র কুরআন হলো, মু'জিযা বা নিদর্শন যার মতো গ্রন্থ কোনো মানুষ বা জিন্ন দেখাতে পারবে না। এর মাঝে সেসব তত্ত্বজ্ঞান ও বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী একীভূত হয়েছে যেগুলো মানবীয় জ্ঞান একত্রিত করতে পারে না বরং এগুলো এমন ওহী যার সদৃশ অন্য কোনো ওহীও নেই, রহমান খোদার পক্ষ থেকে পরবর্তীতে কোনো ওহী আগমন করলেও। কেননা ওহী প্রেরণের মাঝে খোদা তা'লার বিভিন্ন জ্যোতির্বিকাশ হয়ে থাকে আর একথা নিশ্চিত যে, খোদা তা'লার জ্যোতির্বিকাশ যেভাবে খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর প্রতি হয়েছে, এমনটি পূর্বেও কারো প্রতি হয় নি, আর আগামীতেও হবে না। পবিত্র কুরআনের ওহীর যে মর্যাদা রয়েছে ওলী-আউলিয়াদের ওহীর সেই মর্যাদা নেই। (ওলী-আউলিয়াদের প্রতিও ওহী হতে পারে কিন্তু সেই মর্যাদার ওহী হয় না) কুরআনের বাক্যাবলীর ন্যায় কোনো বাক্য তাদের প্রতি ওহী করা হলেও। এর কারণ হলো, কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানের গণ্ডি বাকি সকল গণ্ডি থেকে বৃহৎ কেননা এর মাঝে সকল প্রকার জ্ঞান, সকল প্রকার বিস্ময়কর এবং গোপন বিষয়াদির সমাহার ঘটেছে। সেগুলোর সূক্ষ্ম দিকগুলো অনেক মহান এবং গভীরতায় উপনীত। তা বর্ণনা এবং প্রমাণ বা যুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী, তাতে সবচেয়ে বেশি তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে। আর তা খোদার নিদর্শনমূলক বাণী যা কোনো কান শোনে নি আর এ পর্যায়ে কোনো জিন্ন এবং মানুষের বাণী বা কথা পৌঁছতে পারে না। অতএব কুরআন এবং অন্যান্য বাণীর তুলনা সেই স্বপ্নের সাথে করা যায় যা একজন ন্যায়পরায়, সাহসী ও বিজ্ঞ বাদশাহ্ দেখেছিলেন। উদাহরণ দিচ্ছেন, এক বাদশাহ্ একটি স্বপ্ন দেখেন যিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন এবং সাহসী ছিলেন অপরপক্ষে একজন সাধারণ মানুষ, দুর্বল প্রকৃতির মানুষ এবং ভীরু এক ব্যক্তিও একই স্বপ্ন দেখে যার পদমর্যাদা বাদশাহ্র মতো ছিল না, সাধারণ মানুষ ছিল, তার বিবেক-বুদ্ধিও কম ছিল, ভীরু ছিল। বাহ্যত যদিও বাদশাহ্ ও সাধারণ ব্যক্তির দেখা স্বপ্ন একই অর্থাৎ এক রকম স্বপ্ন কিন্তু বিবেকবান ও বুদ্ধিমানমাত্রই জানে উভয় স্বপ্ন এক নয়। বুদ্ধিমান মানুষ যারা স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা জানেন তারা বলবে, এটি এক রকম স্বপ্নই নয় কেননা ন্যায়পরায়ন বাদশাহ্র স্বপ্নের তা'বীর হবে অনেক উন্নত মানের আর সার্বজনীন এবং কল্যাণকর ও সকল লোকদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ (জনক) আর অত্যন্ত সঠিক ও পরিস্কার। তার স্বপ্নের পরিধি অনেক বৃহৎ। কিন্তু সাধারণের স্বপ্ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশয়পূর্ণ, ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত হয় না। এছাড়া এর প্রভাব পিতা-পুত্র বা নিকটবর্তী কিছু বন্ধুর উর্ধ্বে যায় না। সীমাবদ্ধ গণ্ডি যেমন পুত্র, পিতা অথবা আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব। তাদের পর্যন্ত এটি কল্যাণকর সাব্যস্ত হতে পারে যদি তা কল্যাণকর স্বপ্ন হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, আর অন্যদেরকেও যদি তার স্বপ্নের গণ্ডিভুক্ত করো যে, হ্যাঁ সাধারণ ব্যক্তির স্বপ্নের গণ্ডিতে অন্যরাও আসতে পারে তবুও এর গণ্ডি সীমাবদ্ধ হবে। যতটা সে জানে সেই গণ্ডির ভিতরেই তার স্বপ্নের কার্যকারিতা থাকবে বা আর তা পালান থেকে নেমে ঘরের ভেতরে ঢুকে যাবে। {মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ তাদের স্বপ্ন খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। এর বিস্তৃতি অতটা ব্যাপক হতে পারে না।} কিন্তু পবিত্র কুরআনের বাহনে আরোহণকারীর অবস্থা হলো, তারা জনপদের প্রতিটি গণ্ডিকে অতিক্রম করে। পবিত্র কুরআন এমন একটি ঐশী গ্রন্থ

যার পাদদেশ দিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের নদ-নদী প্রবাহিত হয় আর কোনো পাখির গান যত সুমিষ্টই হোক না কেন, তা কুরআনের ওপর উড়তে পারে না। এর চেয়ে বেশি উন্নতমানের কথা কেউ বলতে পারে না আর কোনো ব্যক্তির পুঁজি যত বেশি বা কমই হোক না কেন, সে এর ধনভাণ্ডার থেকে আহরণ করে। আমার বিশ্বাস, যে বক্তা এর ধনভাণ্ডার থেকে কিছুটা হলেও নেয় না সে রিক্তহস্ত থেকে যাবে। (এখান থেকে কল্যাণমণ্ডিত না হলে কারো বাণী সঠিক হতেই পারে না।) আর ঋণীর কাছ থেকে কঠোরভাবে (ঋণ ফেরত) চাওয়া হয় আর অনেক চেষ্টা করা হয়ে থাকে যেন, কাযী বা বিচারকের কাছে (বিষয়টি) নিয়ে গিয়ে তার নিকট থেকে ঋণের টাকা উসুল করা যায়। কিন্তু পবিত্র কুরআন দরিদ্রদের সদকা দিয়ে থাকে এবং সকল দারিদ্রতা দূর করে বরং নিষ্ঠাবান লোকদের স্বর্ণের ডালি দিয়ে থাকে। (অন্যরা কাউকে কিছু দিলে ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করে কিন্তু পবিত্র কুরআন এমন জ্ঞান দান করে, যে এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণা ক্রমাগতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। এমন যেন স্বর্ণের ডালি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।) ঋণদাতাদের ন্যায় ঋণগ্রহীতাদের অবকাশ দেয়ার খোঁটা দেয় না বরং স্বর্ণ একত্রিত করার ব্যাপারে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি (আ.) বলেছেন, প্রথমে আমরা পানপাত্র হয়েছি এরপর কুরআনের নদ-নদী দ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছি। (আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করছো! আমি তো প্রথমে একটি পেয়ালা হয়েছি, পানপাত্র হয়েছি আর এরপর পবিত্র কুরআনরূপী যে নদ-নদী রয়েছে তার পানি দিয়ে আমি নিজেকে পরিপূর্ণ করেছি। এটি আরবী একটি বাক্যের অনুবাদ। আরবী প্রবন্ধে এমনটি হয় কেননা এর নিজস্ব একটি ধরণ রয়েছে। অনুবাদও এভাবেই করা হয়েছে।)

তিনি (আ.) বলেন, আমার মতে খোদার অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির ওপর যে পবিত্র কুরআনের নিদর্শন হওয়ার কথা অস্বীকার করে আর নিজের বাণী এবং বক্তৃতাকে স্থায়ী কোনো জিনিস মনে করে। খোদার শপথ! আমি এই প্রস্রবণ থেকে পান করি এবং এর সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত হই। এ কারণেই আমার বাণীতে জ্যোতি এবং স্বচ্ছতা দেখা যায় এবং আমাদের বাণীতে আলো এবং স্বচ্ছতা আর সতেজতা ও সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়। পবিত্র কুরআন ছাড়া আমার প্রতি আর কারো অনুগ্রহ নেই আর এটি আমাকে এমনভাবে লালনপালন করেছে যে, পিতামাতাও এমনভাবে লালনপালন করেন না এবং এথেকে খোদা আমাকে সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছেন আর আমরা একে দীপ্তিমান ও সাহায্যকারী হিসেবে পেয়েছি।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমার সাথে যদি আল্লাহ্ তা'লার কোনো নিদর্শন না থাকত এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থন যদি আমার সহায় না হতো আর আমি যদি কুরআন ভিন্ন অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতাম অথবা কুরআনের বিধিনিষেধ ও শরীয়তে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতাম বা রহিত করে থাকতাম কিংবা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনো পথের সন্ধান দিতাম তাহলে অবশ্যই (তাদের) অধিকার ছিল এবং মানুষের এ আপত্তি করা যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হতো যে, আসলেই এই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শত্রু এবং পবিত্র কুরআন ও এর শিক্ষার অস্বীকারকারী এবং তা রহিতকারী। আমি যদি কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর বাণীর বাইরে কিছু বলতাম তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের একথা বলার অধিকার ছিল যে, (আমি কুরআন) রহিতকারী ও পাপী। অর্থাৎ তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে বলতে পারতে যে, আমি একজন পাপী, অসৎ, মুরতাদ। কিন্তু আমি যখন কুরআনে কোনো পরিবর্তন করি নি এবং মহানবী (সা.)-এর আনীত পূর্ববর্তী শরীয়তের এক বিন্দুবিসর্গও পরিবর্তন করি নি, বরং আমি তো কুরআন ও এর বিধিনিষেধের সেবা এবং

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র ধর্মের সেবায় সর্বদা সচেষ্ট আর আমার প্রাণও এই পথে নিবেদিত করে রেখেছি। এছাড়া আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হলো পূর্ণাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের অনুকরণ এবং মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ ব্যতীত নাজাত বা মুক্তি লাভ করা একেবারেই অসম্ভব আর যারা পবিত্র কুরআনের (শিক্ষায়) কমবেশি করে এবং মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে রাখে তাদেরকে আমি কাফির ও মুরতাদ জ্ঞান করি। {যারা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় এবং এর জোয়াল নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে রাখে তারা তো মুরতাদ ও কাফির।} তাহলে এমতাবস্থায় আমার সত্যতার এমন হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও। {আমি শুধু দাবি করেছি এমনটিই নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন নিদর্শনও প্রদর্শন করেছেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে, পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যা বলেছেন, তাঁর প্রতি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে।} যেগুলো আল্লাহ্ তা'লা আজ পর্যন্ত আমার সমর্থনে আকাশ ও পৃথিবীতে প্রকাশ করেছেন, এরপর যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও দাজ্জাল নামে সম্বোধন করে বা যে আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না এবং আমার আহ্বানে সাড়া দেয় না (তার ব্যাপারে) নিশ্চিত জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তাকে ধৃত না করে ছাড়বেন না। কখনো না কখানো সে অবশ্যই ধৃত হবে।

অতএব এটিই হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি। এছাড়া তাঁর মাধ্যমেই কুরআনের (প্রকৃত শিক্ষা) আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং তিনি (আ.) পবিত্র কুরআনে পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন আর আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান দান করেছেন– এ বিষয়টি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। যেসব মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে বা তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করে থাকে যে, নাঊযুবিল্লাহ্ আমরা পবিত্র কুরআন অবমাননা করি, তাদের চিন্তা করা উচিত। এগুলো আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্টের কথা। যেসব লোক হঠকারিতা বা একগুঁয়েমি পরিত্যাগ করে না বা করছে না খোদা তাদেরকে ধৃত না করে ছাড়বেন না। তিনি কীভাবে ধরবেন বা কীভাবে ধৃত করবেন তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের বিধিনিষেধ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে অনেক কথা বলেছেন। তার মধ্য হতে আমি কয়েকটি বিষয় এখানে বর্ণনা করছি। পবিত্র কুরআনে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সম্পর্কে [তিনি (আ.)] বলেন,

মক্কার কাফিরদের মতো যেসব জাতি অন্যায়ভাবে অত্যাচার করে, কষ্ট দেয়, রক্তপাত ঘটায়, পিছু ধাওয়া করে এবং শিশু ও নারীদের হত্যা করে এবং যুদ্ধ করা থেকেও বিরত হয় না, এ ধরনের মানুষের সাথে ন্যায়নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ করা খুবই কঠিন কাজ। মানুষ এতো অত্যাচার করা পরও তাদের সাথে ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়া অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা এমন প্রাণের শত্রুদের অধিকারও নষ্ট করে নি, বরং ন্যায়বিচার ও সদাচরণের উপদেশ দিয়েছে।

অতএব এগুলো হলো সেসব নীতি যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার জামানত। বর্তমানে জাগতিক যুদ্ধে লিপ্ত এসব জাতি যদি এই নীতিটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয় তবেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নতুবা যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তা ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে– তা একটি দেশের চেষ্টায় হোক কিংবা অন্যান্য দেশের

চেষ্টায়; নেতৃত্ব এক দেশে যাক কিংবা অন্য দেশে; চীনে যাক বা অন্য কোথাও যাক। ন্যায় প্রতিষ্ঠা না করলে ধ্বংস অনিবার্য।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, কেউ যদি কুরআনের যুগের প্রতি একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখে যে, পৃথিবীতে বহুবিবাহের বিষয়টি কোন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। (লাগামহীনভাবে) বিয়েশাদী করতো, কতগুলো স্ত্রী থাকতো। মানুষ শত শত কিংবা ৮০টির মতো করে স্ত্রী রাখতো। আর কতইনা ভারসাম্যহীন আচরণ মহিলাদের প্রতি করা হতো! মহিলাদের ওপর কতই না অত্যাচার হতো। অতএব এটি স্বীকার করতেই হবে যে, কুরআন পৃথিবীর প্রতি এই অনুগ্রহ করেছে যে, এসব ভারসাম্যহীনতা দূর করেছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালার অনুগ্রহ যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এসব কুপ্রথা বিলুপ্ত করেছেন। মহিলাদের কোনো সম্মান ছিল না। বিয়ের কোনো সীমা–পরিসীমা ছিল না। (মহিলাদের) কোনো অধিকার ছিল না। এসব কিছু পবিত্র কুরআন প্রদান করেছে এবং ইসলামের পূর্বে এটি কল্পনাও করা যেত না।

পুনরায় একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন কেবল শ্রুত বিষয় পর্যন্তই সীমিত নয়, কেননা এতে মানুষকে বুঝানোর জন্য বড়ো বড়ো যৌক্তিক প্রমাণাদি রয়েছে এবং যত বিশ্বাস, নীতি এবং বিধিবিধান এটি উপস্থাপন করেছে সেগুলোর মাঝে এমন কোনো বিষয় নেই যাতে জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ আছে।

যে–সব বিধিবিধান রয়েছে সেগুলোর মাঝে কোনো বলপ্রয়োগ নেই, কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ ধর্মে কোনো বিষয় জোর করে মানায় না। অর্থাৎ ধর্ম কোনো কিছু জোর করে মানাতে চায় না বরং প্রতিটি বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করে। যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে মানার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আবার পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ শিক্ষার ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

আমাদের খোদা তা'লা যিনি হৃদয়সমূহের গোপন রহস্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। (তিনি) একথার সাক্ষী, কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালার মাঝে এক বিন্দুর এক হাজার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ত্রুটিও বের করতে পারে কিংবা এর বিপরীতে নিজের কোনো গ্রন্থের এক বিন্দু পরিমাণ এমন গুণ প্রমাণ করতে পারে যা কুরআনের শিক্ষার বিপরীত এবং এর চেয়ে উত্তম তবে আমরা মৃত্যুর শাস্তিও মাথা পেতে নিতেও প্রস্তুত।

অতএব এটি এমন বড় দাবি যা পরিপূর্ণ ঈমান এবং দৃঢ়বিশ্বাস ছাড়া করাই সম্ভব না। তিনি (আ.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখে এবং পবিত্র কুরআনে খোদা তা'লা কী বর্ণনা করেছেন তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে তাহলে সে ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায় জগৎ-সংসার পরিত্যাগ করে খোদার হয়ে যাবে। কোনো ব্যক্তির ঈমান যদি পরিপূর্ণ হয় আর পবিত্র কুরআনের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে তবে জগতের পরিবর্তে খোদা তা'লার প্রতি সর্বদা তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এই জ্ঞান দান করুন।

তিনি (আ.) বলেন, বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে সকল ঐশী গ্রন্থের মাঝে একমাত্র পবিত্র কুরআনই রয়েছে যার ঐশীবাণী হবার বিষয়টি অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। যার পরিত্রাণের নীতি ষোলোআনা সততা ও মানবপ্রকৃতি সম্মত। অর্থাৎ নাজাত বা পরিত্রাণের যে নীতি রয়েছে তা মানবপ্রকৃতি সম্মত। যার বিভিন্ন আকিদা বা বিশ্বাস এমন পরিপূর্ণ ও দৃঢ়

যার শক্তিশালী দলিলপ্রমাণ এর সত্যতার অকাট্য সাক্ষী, যার বিধিবিধান কেবলই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার শিক্ষামালা সকল প্রকার শিরকের কালিমা, বিদআত এবং সৃষ্টিপূজা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। যাতে একত্ববাদ, আল্লাহ্ তা'লার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য চরম পর্যায়ের উদ্দীপনা রয়েছে এবং যার বৈশিষ্ট্য হলো, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই এটি সুস্পষ্ট একত্ববাদে পরিপূর্ণ আর কোনো প্রকার কালিমা, ক্ষতি, ত্রুটিবিচ্যুতি, অকর্মন্য বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করে না এবং কোনো বিশ্বাসকে জোরপূর্বক মানাতে চায় না। এটি জোরপূর্বক কোনো বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে চায় না বরং দলিল উপস্থাপন করে। তিনি (আ.) বলেন, যে শিক্ষা দেয় প্রথমে তার সত্যতার বিভিন্ন হেতু দেখিয়ে দেয় এবং প্রত্যেক চাহিদা ও দাবিকে অকাট্য দলিলপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করে আর প্রতিটি নীতির প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলিলপ্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এছাড়া যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি, অপবিত্রতা, অনিষ্ট ও নৈরাজ্য মানুষের বিশ্বাস, আমল, কথা ও কর্মে নিহিত রয়েছে সেসব বিশৃঙ্খলাকে সুস্পষ্ট দলিলপ্রমাণের আলোকে দূর করে এবং এমনসব শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় যা মানুষকে মানুষে পরিণত হওয়ার জন্য একান্ত আবশ্যক। মানুষ হওয়ার জন্যও আদব বা শিষ্ঠাচারের প্রয়োজন রয়েছে আর সেসব আদব বা শিষ্টাচারের শিক্ষা পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। এছাড়া প্রত্যেক মন্দকে এটি সেভাবেই প্রতিহত করে যেভাবে তা বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন নয় যে, কোনো এক যুগের মন্দকে প্রতিহত করেছে, বরং প্রত্যেক মন্দকে এটি সেভাবেই প্রতিহত করে যেভাবে তা প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ যে গতিতে বতর্মানে প্রচলিত আছে সেই গতিতেই এর প্রতিরোধও সেখান থেকে উদ্ভূত হয়, এর চিকিৎসা বেরিয়ে আসে ও একে প্রতিহত করে। আর এর শিক্ষা অত্যন্ত সুদৃঢ়, শক্তিশালী, বলিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ মনে হয় যেন প্রকৃতির বিধানের একটি দর্পণস্বরূপ এবং প্রাকৃতিক নিয়মের এক প্রতিবিম্বস্বরূপ আর হৃদয় ও অন্তরের দৃষ্টিশক্তির জন্য প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায়। অর্থাৎ প্রদীপ্ত সূর্য। আর জ্ঞানের সংকীর্ণতাকে বিস্তৃতিদাতা এবং এর ক্ষতি পূরণকারী। যেসব জ্ঞানের কথা সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে সেগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে এবং ক্ষতি বা ঘাটতি পূরণ করে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে পবিত্র কুরআনের অনুসরণকারী, এর শিক্ষা মান্যকারী, একে অনুধাবনকারী এবং এর অনুকরণে নিজেদের জীবন পরিচালনাকারী বানান। রমযান মাসের পরেও এই নিয়ামত থেকে এভাবেই কল্যাণ লাভের চেষ্টা করতে থাকুন যেভাবে রমযান মাসে করছেন। রমযানে জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অনিষ্টকারীর হাতকে প্রতিহত করুন এবং তাদেরকে ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন। পৃথিবীকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও সামগ্রিকভাবে অনেক দোয়া করুন। অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনেও বর্তমানে অনেক বড় নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অত্যাচারীর অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করুন এবং মুসলিম বিশ্বের নেতাদের বিবেকবুদ্ধি দান করুন যেন তারা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থের সুরক্ষাকরী হয়। আল্লাহ্ তা'লা এই রমযানে আমাদের জন্য কল্যাণ ও আশিসের দ্বার পূর্বের চেয়ে আরো বেশি উন্মুক্ত করুন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)